যুগান্তর

শতফুল ফুটতে দাও: বিনা দোষে মেধাবী হত্যা

প্রকাশ : ১৩ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. মাহবুব উল্লাহ্

নিষ্ঠুরতা আর কতদূর গড়ালে আমাদের সমাজে সুস্থতা ও সুবিবেচনাবোধ ফিরে আসবে? সবকিছুরই একটা শেষ আছে। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছিল তারও পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নাজিবাদী হিটলার ও ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি আত্মহত্যা করে তাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে দেখা যায় অত্যাচারী শাসকরা অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকে। এই টিকে থাকার জন্য তারা যে অস্ত্রটি ব্যবহার করে তা হল সমাজে মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়া। নানা রকম কৌশল ব্যবহার করে ভীতির রাজ্য সৃষ্টি করা হয়।

এই কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া, অপছন্দের ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য তছনছ করে দেয়া এবং চাকরি-বাকরি ও জীবন-জীবিকার ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। ক্ষমতার মসনদে যে বা যারা আসীন হবে তাদের কোনো মন্দ থাকতে নেই, তারা থাকবেন সমালোচনার ঊর্ধ্বে। যদি কেউ সমালোচনা করে, যে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করেই হোক না কেন, তাকে হেনস্তা হতেই হয়। এর জন্য রয়েছে নানা রকম আইনের অস্ত্র।

বাংলাদেশে এখন কয়েক ডজন প্রাইভেট টিভি চ্যানেল। দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যাও কম নয়। আরও রয়েছে অনলাইন নিউজ মিডিয়া। এসব গণমাধ্যমের সংখ্যা উল্লেখ করে সরকারি দলের লোকজন যারা টিভি টকশোতে আসেন, তারা বলতে চান এতগুলো গণমাধ্যমে যে কেউ যে কোনো কিছু বলতে পারে, তাহলে দেশে বাকস্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, গণতন্ত্র নেই এমন কথা বলা অযৌক্তিক এবং অর্থহীন। হ্যাঁ, কিছু কথা এসব মাধ্যমে বলা যায় বটে, তবে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি ওই এক জায়গাতেই। চ্যানেল ও সংবাদপত্রগুলোর মালিক কারা? কাদেরকে চ্যানেল খোলার লাইসেন্স দেয়া হয়? ব্যতিক্রমী চিন্তার কোনো ব্যক্তি এসব লাইসেন্স পায় কি? কাজেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে মনোপলি পাওয়ার দরকার, সেটি যাদের হাতে থাকা দরকার তাদের হাতেই রয়েছে। টকশোগুলোতে গেস্ট হিসেবে কারা আসবেন তাও পর্দার আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। চ্যানেল বন্ধ করে দেয়ার নজিরও আছে। গত কয়েক মাস ধরে টকশোগুলোর মান আরও পড়ে গেছে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক কিংবা উপস্থাপিকারা প্রায়ই একটি দলের

হয়ে কথা বলেন, যা তাদের বলার কথা নয়। সংবাদপত্রগুলোও স্পর্শকাতর সংবাদ প্রকাশ করতে চায় না। দেখা যায়, বিদেশের সংবাদপত্রে বাংলাদেশ নিয়ে কোনো বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হলে তার প্রতিফলন দেশীয় সংবাদপত্রগুলোতে দেখা যায় না। মূল স্ট্র্যাটেজি হল- গণতন্ত্রের ভড়ং বজায় রেখে এর মর্মবস্তুকে ছিন্ন-বিছিন্ন করা। এতে মানুষকে বোকা বানানো সহজ হয়। সমস্যাটি হল, বাংলাদেশের মানুষ এতসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে যে তাদের কোনো রকম ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। তারা নির্বাক হয়ে চুপচাপ বসে থাকলেও মনে মনে উপলব্ধি করতে পারে, কী সব হচ্ছে!

এতক্ষণ মানুষকে বোকা বানিয়ে চুপচাপ রাখার কৌশলের কথা বলেছি। কিন্তু, মজার ব্যাপার হল এরা মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে বসে যা তাদের সব বুদ্ধির খেলাকে নিরর্থক করে তোলে। তেমনি ঘটনা ঘটেছে বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডে। আবরার সত্যিই একজন মেধাবী ছাত্র ছিল। বেঁচে থাকলে দেশকে অনেক কিছুই দিতে পারত। ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় গোল্ডেন-এ পাওয়া ছেলেমেয়েরাও ভর্তির সুযোগ পায় না। কিন্তু আবরার ফাহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেও ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল প্রকৌশলী হওয়া। মেডিকেলে কিছু দিন ক্লাস করার পর ভর্তি হন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট)। আবরারের প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরারকে গত রোববার রাতে পিটিয়ে হত্যা করে বুয়েট ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক কিছু চুক্তির সমালোচনা করে ফেসবুকে আবরার-এর কিছু স্ট্যাটাস এ হত্যার কারণ বলে পরদিন সোমবার বুয়েটের ক্যাম্পাসে আলোচনা ছিল। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা চলছে। তার সর্বশেষ স্ট্যাটাস ছিল গত সপ্তাহের শনিবার বিকাল ৫টা ৩২ মিনিটে। তাতে ভারতকে মোংলা বন্দর ব্যবহার ও গ্যাস রফতানির সমালোচনা ছিল। এর পরদিন রোববার রাতে বুয়েটের শেরেবাংলা আবাসিক হলের নিজ কক্ষ থেকে আবরারকে ডেকে নিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। এরপর রাত হলে খবর ছড়ানো হয়, 'শিবির' সন্দেহে আবরারকে পেটানো হয়েছে। যদিও সংবাদপত্রের সূত্রগুলো খোঁজ নিয়ে জেনেছে কুষ্টিয়ায় আবরারের পরিবারের সদস্যরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ফ্র্যাংকেনস্টাইন সৃষ্টি করলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। এদেশে প্রবাদ আছে, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। আওয়ামী লীগ সরকার যে বজ্র আঁটুনি দিয়েছে তাতে কোনো বিরোধী দলের পক্ষে 'টুঁ' শব্দ করাও দুরূহ। ক্যাসিনো-কাণ্ডে যুবলীগের কোনো কোনো নেতার সংশ্লিষ্টতা উদঘাটিত হওয়ার পর বলা হচ্ছিল দলের ইমেজ যারা নষ্ট করবে তাদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না। ইমেজ নষ্ট হওয়ার মতো অনেক ঘটনাই তো ঘটেছে। ত্বকী হত্যার বিচার হল না, তনু হত্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হল না। সাগর-রুনী হত্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হবে এমন আশা দুরাশায় পরিণত হতে চলছে। আবরারের হত্যাকাণ্ডে বুয়েটের ছাত্রলীগ নেতারা জড়িত বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে গর্হিত অভিযোগ ওঠার পর। এর পরপরই কীভাবে বুয়েট শাখার ছাত্রলীগ নেতারা একজন জুনিয়র প্রতিভাবান ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করার দুঃসাহস দেখাল তা ভেবেও কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, দুঃসাহস ও দুর্বৃত্তপনা এত গভীরে পৌঁছে গেছে যে, কোনো কিছুই এগুলোকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। অবস্থা দেখে মনে হয় গোটা সমাজদেহে পচন ধরেছে। এ পচন থেকে সমাজকে, দেশকে কীভাবে উদ্ধার করা যায় উপায় খুঁজে বের করা প্রতিটি দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব।

আবরার সুনির্দিষ্ট কোনো ছাত্রসংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ তরুণ যে দেশ ও দেশের মর্যাদাকে শিরোধার্য করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার একটি ভিন্ন ভাবমূর্তি লক্ষ করা গেছে। এ ভাবমূর্তি হল নতজানু নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের। আবরার হত্যার কারণ ভিন্নমত- এমন শিরোনামও সংবাদপত্রে এসেছে। সংবাদপত্র থেকেই তার পোস্টের বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। 'দেশভাগের পর দেশের পশ্চিমাংশে কোনো সমুদ্রবন্দর না থাকায় তৎকালীন সরকার ৬ মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের অনুরোধ করেছিল। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই মোংলা বন্দর খুলে দেয়া হয়েছিল। আর এখন ভারতকে সেই মোংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য বলতে হচ্ছে।' আবার ভারতের দুই রাজ্যের মধ্যকার পানি নিয়ে বিরোধের কথা উল্লেখ করে আবরার লিখেছিলেন, 'যে দেশের এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চায় না, সেখানে আমরা বিনিময় ছাড়াই পানি দেব।' একইভাবে আবরার গ্যাস চুক্তিরও সমালোচনা করেছিলেন। সবশেষে একটি কবিতার চারটি লাইন তুলে ধরেছিলেন তিনি। ভিন্নমতের জন্য আবরারকে হত্যা করা হয়েছে এ ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। এমনকি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও এ নিয়ে কথা বলেছেন। গতকাল সচিবালয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমি যতটুকু বুঝি, এখানে ভিন্নমতের জন্য একজন মানুষকে মেরে ফেলার কোনো অধিকার নেই।'

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি বাজে কালচার চালু হয়েছে। আর সেটি হল সন্দেহ হলেই যে কাউকে শিবির বলে মারধর করা। এমনকি থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া। এরপর আমরা আর জানতে পারি না, থানা পুলিশ কী পেল? সন্দেহভাজন ব্যক্তির কী হল?

এবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভারত রাডার বসাবে বলে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ নিয়ে ভারতীয় পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হলেও, বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো ব্যাপারটি ব্ল্যাক আউট করাই নিরাপদ বোধ করেছে। প্রশ্ন হল, একটি স্বাধীন দেশের উপকূলীয় এলাকায় একটি বিদেশি রাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনা নির্মাণের

হেতু কী? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা কু-যুক্তি হাজির করে হয়তো বলবেন, ইউরোপে কি ন্যাটো সৈন্য নেই? সেখানে কি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নেই? আফগানিস্তানেও তো ন্যাটো বাহিনী ও মার্কিন বাহিনী অবস্থান করছে। তাহলে বাংলাদেশে ভারতের রাডার ঘাঁটি থাকতে আপত্তি কেন? আমার জিজ্ঞাসা হল, বাংলাদেশ কি আফগানিস্তান? পশ্চিম ইউরোপ একসময় সোভিয়েত ব্লক থেকে নিরাপত্তা হুমকি অনুভব করত। একই অনুভূতি ছিল সোভিয়েত ছাতার নিচে অবস্থানরত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর। সেজন্যই ন্যাটো জোট ও ওয়ারশ জোট হয়েছিল। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের চারদিকে বলতে গেলে ভারতই অবস্থান করে। কিন্তু ভারত থেকে যদি হুমকি কল্পনা করা হয় তাহলে ভারতের তৈরি রাডার স্টেশনগুলো কি কাজে লাগবে? নাকি চীনের কাছ থেকে আমাদের নৌবাহিনী সাবমেরিন সংগ্রহ করেছে বলে রাডার স্টেশন বসানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাবমেরিন তো থাকে পানির নিচে। সেটা রাডার দিয়ে দেখা যায় না। তবে কি বঙ্গোপসাগরে তথা ভারত মহাসাগরে চীনের আনাগোনা লক্ষ করার জন্য এসব রাডার স্টেশন তৈরি করা হবে? কিন্তু আন্দামান ও নিকবর দ্বীপে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ভারতের সামরিক নজরদারি করার স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। তাহলে বাংলাদেশের উপকূলে ভারতকে কেন আসতে হবে? এর উদ্দেশ্য কি শেষ বিচারে বাংলাদেশের ওপর নজরদারি করা? এর মধ্যে ভারত বাংলাদেশকে ৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণ দিয়েছে ভারতীয় সমরাস্ত্র কেনার জন্য। সেই সমরাস্ত্রের মান যাই হোক না কেন, আসলে ভারত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে একটা অবস্থান সৃষ্টি করতে চাইছে। যদিও আমরা কামনা করি না, তবুও একথা তো যথার্থ যে, ভারতের সঙ্গেই আমাদের ব্যাপক স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এমতাবস্থায় অনেক দূরবর্তী হলেও ভারতের সঙ্গেই বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষীণতম আশঙ্কা থাকলেও থাকতে পারে। ভারত এ জায়গাটিতেই সবদিক থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করে রাখতে চায়। বাংলাদেশ ভারতকে যা দিয়েছে সেটা অর্থকড়ির অংকে হিসাব করা যায় না। উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা শঙ্কায় বাংলাদেশ যেভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে ভারতের কোনো রকম শঙ্কা পোষণ করা একেবারেই অযৌক্তিক।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত তার কোনো প্রতিবেশীকেই আস্থায় নিতে পারছে না। এর মধ্যে ঐতিহাসিক কারণে ব্যতিক্রম ছিল বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশকে নিয়েই সন্দেহ। কী ভয়াবহ ব্যাপার! এ কারণেই শত-সহস্র আধিপত্যবাদবিরোধী আবরারের জন্ম হবে। আবরারদের পিটিয়ে মারলে আবরারদের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাবে। তখন গোটা বাংলাদেশটাই হয়ে উঠবে ভারতের জন্য অনিরাপদ একটি জনপদ। ভারতের সাউথ ব্লক এবং 'র'-এর কর্মকর্তারা এ পরিণতি যদি বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নির্মাণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলেই স্বস্তি মিলবে। এসব কর্মকর্তার মনে রাখা উচিত, এনআরসি করে বাংলাদেশের ওপর বাড়তি লোকের বোঝা চাপিয়ে দিলে গোটা অঞ্চলটাই Balkanization-এর কবলে পড়বে। তাদের মনে রাখা উচিত, ভিয়েতনামিরা প্রথমবার যুদ্ধ করেছিল ফরাসিদের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করেছিল মার্কিনিদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের সব অভিজ্ঞতাই কোনো না কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।